National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2026; 1(66): 49-53
© 2026 NJHSR
www.sanskritarticle.com

Mallika Sen
Phd Scholar
Lucknow Campus Under Central Sanskrit University,
Gomti Nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226010

Correspondence:
Mallika Sen
Phd Scholar
Lucknow Campus Under Central Sanskrit University,
Gomti Nagar, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226010

মহাভারত ও নারী

মল্লিকা সেন

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20257950

মহাভারত যেন এক বিস্তৃত বিশ্বকোষ। বিশালতা এবং বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্য। তাই মহাভারতের আদি পর্বে (১/৩০০) বলা হয়েছে--- 'মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।'[১] বস্তুতঃ ভারতবর্ষের যা কিছু তত্ত্ব ও তথ্য তা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মহাকাব্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

মহাভারতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দার্শনিকতা, বৈরাগ্য, ত্যাগের অনাসক্তির প্রচুর উপদেশ, বিশেষত অনুপম স্বর্ণসমুজ্জ্বল জীবনবোধের বিরুদ্ধে আবেগের যুগপত্ সমাবেশ ও অন্তর্নিহিত আততিই সৃষ্টি করে এই মহাকাব্যকে।

তেমনি আমার বর্ণনীয় বিষয় হল---মহাভারতে নারীদের আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত, চরিত্র ও ভাগ্যের সংঘর্ষ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির (ব্যবধান, যোগ্যতা ও সার্থকতার পার্থক্য এইসবের মধ্যে নিহিত সেই আততি যা সৃষ্টি করেছে, এ মহাকাব্যের অন্তর্গূঢ় চাপ ও তাপ, যার থেকে উত্সারিত এর মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব। যেমন---ক্ষত্রিয়াভিমানী দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, ধর্মপ্রাণা গান্ধারীর মনস্বিতা, কুন্তীর মাতৃত্ব, মাদ্রীর পতিব্রতা প্রভৃতি ভারতবাসীর প্রাত্যহিক সমাজ, জীবন ও সাহিত্যে শাশ্বত প্রভাব বিস্তার করেছে।

মহাভারতে প্রতিবাদী নারী চরিত্র অনেকগুলি আছে, যারা দৈব কিংবা ভাগ্য বলে কোনও কিছুকেই মানতে চায়নি। নারীত্বের দাবি নিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অম্বা, শকুন্তলা, কুন্তী, দ্রৌপদী, উলূপী---এদের সকলেরই দাবি ছিল নারীত্বের আবার চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, হিড়িম্বা চিরন্তনী প্রেমময়ী নারী---সব বিচারেই মহাভারত অত্যন্ত আধুনিক সাহিত্য।

প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসাবে অম্বা নারী চরিত্র এতখানি মহাভারতে কোথাও নেই। ভীষ্ম কর্তব্য স্থির করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অম্বাকে শাল্বরাজার কাছে প্রেরণ করেন, কিন্তু শাল্বরাজা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

এই পর্যায় থেকে অম্বার পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ, পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধের পর অম্বার কঠিন তপস্যা, মহাদেবের কাছে অম্বার বরপ্রাপ্তি, শিখণ্ডিনীরূপে তাঁর দ্রুপদ রাজার গৃহে জন্ম, বিবাহ, স্থূণাকর্ণের সঙ্গে লিঙ্গবিনিময় ও পুরুষত্ব প্রাপ্তি, দ্রোণাচার্যের কাছে তাঁর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে মহারথ হিসাবে গণ্য হওয়া।

প্রত্যাখ্যাতা রমণীর প্রতিশোধ স্পৃহা কতদূর যেতে পারে, অম্বা চরিত্রটি তার উত্কৃষ্ট প্রমাণ।

গ্যেটে লিখেছিলেন, ''কেউ যদি তরুণ বত্সরের ফুল ও পরিণত বত্সরের ফল, কেউ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখতে চায়, তবে শকুন্তলায় তা পাবে।'' এ শকুন্তলা কিন্তু কালিদাসের, ব্যাসদেবের নয়।

ব্যাসদেবের শকুন্তলা অবলা নারী নন, তিনি দুষ্মন্তকে অনায়াসে বলেছেন---দুষ্মন্তের সহায়তা ব্যতীত ভরত চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত ধরণীর সম্রাট হবে। ব্যাসদেবের শকুন্তলা দুষ্মন্তের কাছে দাবি জানিয়েছেন, আপন সততায়, অপাপবিদ্ধতায়। ভরতবংশের প্রতিষ্ঠা মহাভারতের দুর্লভতম মুহূর্ত। শকুন্তলা-পুত্র ভরতের নামকরণে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ।

মহাভারত হচ্ছে সেই দর্পণ, যাতে মানুষ যেভাবে দেখতে চায়, চরিত্রকে সেইভাবে দেখতে পারে।

কুন্তী মহাভারতের এক অসাধারণ চরিত্র। দ্রৌপদী ভিন্ন এতখানি মমতা অন্য কোনো চরিত্রে আঁকা হয়নি। আমাদের দেশের মুনিঋষিদের বিচারধারাও স্বতন্ত্র ছিল। তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যায় কুন্তী, দ্রৌপদীকে স্থান দিয়েছেন।

কুন্তী মহাভারতের সর্বাপেক্ষা নিঃসঙ্গ নারী। রাজবাটীতে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মদাতা পিতা প্রতিশ্রুতি রাখার জন্য অন্য রাজার কাছে তাঁকে দান করলেন। সেখানে কুন্তী রাজ্যসুখ হয়তো পেয়েছিলেন, কিন্তু সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। পালক পিতাও দেখলেন যে গৃহকর্ত্রীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে মেয়েটি কেবলমাত্র শৃঙ্খলার পরিচয় নয়---বুদ্ধি, বিবেচনা ও চূড়ান্ত দায়িত্ববোধের পরিচয় দিল। চতুর্দশী কুন্তীর উপর দায়িত্ব পড়ল,ভয়ংকর তপস্বী দুর্বাসার আতিথ্য সত্কারের। পরীক্ষায় কুন্তী এতদূর সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন যে, দুর্বাসা তাঁকে দিলেন 'অভিকর্ষণ

মন্ত্র'। কৌতুহলী কুন্তী বালিকার চাপল্যে সূর্যদেবকে ডেকে বসলেন। জন্ম হল কর্ণের। লোকলজ্জায়, পিতৃসম্ভ্রম রক্ষার জন্য জন্মদাতা পুরুষের আদেশেই সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিতে হল কুন্তীকে। কিন্তু কালের প্রভাবে ভাসিয়ে দেওয়া এই পুত্রের জন্য গভীর ক্ষত তাঁর মনের মধ্যে সৃষ্টি হল।

বিবাহের পর মুনিশাপে অভিশপ্ত নির্বীর্য স্বামী পাণ্ডুই তাঁকে প্ররোচিত করেন তিন ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীর (ধর্মদেব, পবনদেব, দেবরাজ ইন্দ্র) কাছ থেকে প্রথম তিন পাণ্ডবকে লাভ করতে। স্বামীর অনুরোধে সপত্নী মাদ্রীকে অভিকর্ষণ মন্ত্র শেখানোর ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রসে মাদ্রীর গর্ভে জন্ম হল নকুল ও সহদেবের। মাতৃত্ব অনেক সময় অনিচ্ছুক নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত। যেমন---অম্বিকা ও অম্বালিকাও সন্তান ধারণ করতে ব্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মৃত বা নির্বীর্য পুরুষের সম্পত্তির জন্য পুত্ররূপ উত্তরাধিকারী লাভের কামনাই এই প্রথার মূলে ছিল। মহাভারতে দেখি কন্যা শোকের কারণ (১/৫৯/১)।[২] পূর্বজন্মের পাপের ফলে নারী হয়ে জন্মাতে হয় (৬/৩৩/৩২)।[৩]

বিবাহ, স্বামীর প্রজনন শক্তি হারানো, পুত্রদের প্রতিমুহূর্তে গুপ্তহত্যার আশঙ্কা, দ্যূতক্রীড়া,পুত্রবধূর চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, পুত্র-পুত্রবধূর বনবাস, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, কানীন পুত্র ও পৌত্রদের বিনাশ এরপর জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখা এবং তারপরই আশ্রমে চলে যাওয়া পর্যন্ত কুন্তীর জীবনে প্রায় সবটাই নিসঃঙ্গতা। তপোবনে কুন্তীর অগ্নিদাহে মৃত্যু ঘটল। অগ্নিদেব এই চির মনস্বিনী নারীকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সমস্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাঁর প্রতিটি বিষয়ে কর্তব্যসাধন, তাঁর মহত্ত্ব আমাদের সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করে।

চন্দ্রভাগা, যজ্ঞবেদি সমদ্ভূতা, অযোনি সম্ভূতা, নাথবৎ অনাথবতী, কৃষ্ণসখী, পঞ্চপাণ্ডবের পট্টমহিষী, কৃষ্ণা ও পাঞ্চালী-নাম আর বিশেষণ লিখতে লিখতে পাতা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু দ্রৌপদীর বর্ণনা ফুরোবে না। মহাভারত মহাকাব্যের নায়িকা দ্রৌপদী। চতুঃষষ্টি কলানিপুণা অন্যবদ্যাঙ্গী নারী দ্রৌপদী তেজস্বিতায়, মননে, চিন্তায় তাঁর তুল্য নারী মহাকাব্যেই রচিত হয়নি, পুরুষের কামাগ্নিতে পুড়ে সীতাহরণ, আগুনে পুড়িয়েই সীতাদেবীর স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন। কিন্তু দ্রৌপদীকে অগ্নি সারাজীবন বইতে হয়েছে। হেলেন, পেনিলোপি, সীতাদেবী অনন্য সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর সৌন্দর্য সমস্ত পৃথিবী ব্যপ্ত। দ্রৌপদীকে অসম্মান করে কীচক সবংশে ধ্বংস হলেন, কৌরবরা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হলেন।

জন্মমুহূর্তে আকাশবাণী দ্রৌপদীর নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণা বৈদূর্যমণিসন্নিভ, শ্যামাঙ্গী, শ্রীময়ী। দ্রৌপদীকে মহাভারত পাঠক কথা বলতে শোনে স্বয়ংবরসভায়। সূতপুত্রকে বিবাহ করতে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে তিনি বলেন, ''নাহং বরয়ামি সূতম্'' অর্জুন লক্ষ্যভেদ করলে বিধি অনুসারে ভুবন বিখ্যাত পঞ্চবীর স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্রৌপদী হস্তিনায় এসেছিলেন পাণ্ডবদের পট্টমহিষী হিসাবে রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে। বনবাসে গেলেন চূড়ান্ত অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা আর অসম্মান নিয়ে ভিখারিনি মূর্তিতে। পুরুষের কামনার কদর্যরূপ তিনি দেখলেন হস্তিনাপুরের রাজসভায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, কৌরব বংশ ধ্বংস করবেন, দুর্যোধনের মৃত্যু ঘটবে---দুঃশাসনের শ্যাম বাহু, যা তাঁর অভিষিক্ত কেশ আকর্ষণ করে মৃত্যু ঘটেছিল কীচকের। তাঁকে পদাঘাত করার জন্য কীচকের পদদ্বয় ভীম তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্রৌপদী তেজস্বিতা, বাগ্মীশ্রেষ্ঠা, বিদুষী এবং সবলা নারী। সীতাদেবীর মতো তিনি কখনও বলেননি---মা ধরণী, দ্বিধাবিভক্ত হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি। দ্রৌপদী অসাধারণ বাগ্মী, পঞ্চ ইন্দ্রের মতো পাঁচ স্বামী ছিল তাঁর। কিন্তু যখন প্রয়োজন,তিনি তখনই ব্যঙ্গ করেছেন অনন্ত স্বামীকে তাঁর মনে ক্ষত্রিয় বীর সম্বন্ধে যে আদর্শ ছিল স্বামীদের আচরণে তার নানা ব্যত্যয় দেখে তিনি বারে বারে প্রতিবাদ করেছেন, ফলে প্রচলিত অর্থে পতিব্রতা ধর্মের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত বিরোধ দেখা গিয়েছিল---প্রয়োজনমত স্বামীদের এমনকি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও, তিনি ভর্ৎসনা করেছেন।

দ্রৌপদী বীর ক্ষত্রিয় স্বামীদের নিরুদম্য দেখে বারবার ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছেন, পুরুষ বাক্যে তাঁদের ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি আগে বুঝতে পারেননি যে যুদ্ধে জয় হলেও, পাঁচটি স্বামী জীবিত থাকলেও, সম্রাজ্ঞী পদে তাঁর প্রতিষ্ঠা আসন্ন হলেও জীবন তাঁর কাছে পুত্রহারা সর্বরিক্তায় বিবর্ণ,মলিন হয়ে যাবে। মাতৃত্বের অসীম স্নেহের পরিচায়ক দ্রৌপদী গান্ধারীকে বলেছেন কিংরাজ্যেন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মমা (মহাভারত ১১/১৫/১৩)[৪] অথবা 'পুত্রহীনা আমার রাজ্য দিয়ে কী হবে?' শুধুমাত্র পাণ্ডবেরা নয়---কৌরবরাও দ্রৌপদীর অনন্যতা বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাই দ্যূতক্রীড়ায় তাঁরা পাণ্ডবদের অন্য স্ত্রীদের উল্লেখ করেননি, দ্রৌপদীর বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির বললেন,

নৈব হ্রস্বা ন মহতী নাতিকৃষ্ণা ন রোহিণী
নীল কুঞ্চিত কেশী চ ত্বয়া দীব্যাম্যহং দ্বয়া।।

(সভা ৬২/২৯)[৫]

অর্থাত্ ''যিনি খর্বা নন, দীর্ঘও নন এবং অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা নন, রক্তবর্ণাও নন, আর যাঁর কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ এবং বক্র, সেই দ্রৌপদী দ্বারাই আমি আপনার সঙ্গে খেলা করব।''

দ্রৌপদী অনন্তযৌবনা নারী ছিলেন।

মহাভারতে দ্রৌপদীই কেবলমাত্র কৃষ্ণকে কৃষ্ণ নামে সম্বোধন করেছেন। তার কারণ সম্ভবত নিজ নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি যে কৃষ্ণের সহচরী প্রিয়সখী, তা ঘোষণা করা।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আটাত্তর বত্সর পঞ্চপাণ্ডবের গৃহিনী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ভুবনবিজয়ী পাঁচ স্বামীকে দ্রৌপদী কোনও অসতী নারীর মতো মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বশ করেননি---বশ করেছিলেন তাঁর সদাসর্বদা সতর্ক পরিচর্যা ও গৃহিণীপনায় ও পাতিব্রতাবোধে। তার প্রমাণ পাই তার উক্তিতে। দ্রৌপদী স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে সত্যভামাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ''আমি সভয়ে আমার স্বামীদের সেবা করি, যেন তারা ক্রুদ্ধ সর্প (৩/২২/১৮)।''[৬] আমি কখনো আমার স্বামীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করি না, কখনো তাঁদের ছাড়িয়ে যাই না, কখনো আমার শাশুড়ির বিরোধিতা করি না।[৭] আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পত্নীদেরও সেবা করি (৩/২২২/১৮)।[৮] এক নারীর উচিত তার নিজের প্রাণের বিনিময়েও তার স্বামীর মঙ্গল করা (৩/১৪/৪)।[৯] এই হল সাধ্বী স্ত্রীর, 'সতী' স্ত্রীর কর্তব্য। এমনকি তিনি দাসদাসী, অতিথি-অভ্যাগত, স্নাতক, ব্রাহ্মণ সকলের সংবাদ রাখতেন।

পৃথিবীর চার আদি মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা তেজস্বিনী নারী দ্রৌপদী। মননশীলতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, যে-কোনও বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস, স্বামীগর্বে গর্বিতা দ্রৌপদী তাই মুনি ঋষিদের চোখেও মহাভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্তর্গত। পুরুষপ্রধান সমাজে এই নারীটি তাই চিরশ্রদ্ধেয়া।

পতিব্রতা গান্ধারী। স্বামীকে অতিক্রম করবেন না বলে পতিব্রতাথিনী তিনি একখানি পট্টবস্ত্র নিজের নয়নযুগল বন্ধন করলেন । সুন্দরী গান্ধারী স্বভাব, ব্যবহার এবং কার্যদ্বারা সমস্ত কুরুবংশীয় লোকের সন্তোষ জন্মাতে থাকলেন। ধৃতরাষ্ট্র

কেবলমাত্র জন্মান্ধ ছিলেন না, স্নেহান্ধও ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্নেহান্ধতাও গান্ধারীকে স্পর্শ করেছিল। এই হল গান্ধারীর পতিব্রতাবোধের দৃষ্টান্ত।ভারতীয় মুনিঋষিরা সেই গান্ধারীকে প্রাতঃস্মরণীয় 'অহল্যা কুন্তী তারা দ্রৌপদী মন্দোদরী' পঞ্চকন্যার মধ্যে অন্তর্গত করলেন না।

একদা বেদব্যাস ক্ষুধায় ও পথশ্রমে কাতর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন গান্ধারী উপযুক্তভাব তাঁর শুশ্রুষা করেন এবং বেদব্যাস তাঁকে বর দেন, বলবান ও গুণবান নিজের একশত পুত্র হবার, তারপর তিনি ধৃতরাষ্ট্র থেকে গর্ভধারণ করলে কিন্তু গান্ধারী দুবছর পর্যন্ত সেই গর্ভ উদরেই ধারণ করে রইলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ এল যে নবোদিত সূর্যের তুল্য তেজস্বী একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন পাণ্ডুপত্নী কুন্তী। কুন্তীর পুত্র আগে জন্মগ্রহণ করার ঈর্ষা গান্ধারীর ছিল, তখন গান্ধারী মনোদুঃখে কর্তব্যজ্ঞান শূন্য হয়ে বিশেষ চেষ্টা করে ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে সেই গর্ভপাত করলেন।

পান্ডু মৃত্যুবরণ করলে দেবী গান্ধারী কুন্তীকে কোনও সান্ত্বনা দিলেন না। সদ্য পিতৃহারা পাণ্ডবদের কোনও আশ্বাস দিলেন না। আবার পাণ্ডবদের জতুগৃহে ভস্মীভূত হয়ে পুড়ে মৃত্যুর সংবাদ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধারীর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

পুত্র দুর্যোধন কপট পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব কেড়ে নিলে গান্ধারী খুব একটা দুঃখিত হননি। তিনি চেয়েছিলেন পুত্র সসাগরা ধরণীর অধিপতি হোক। রাজসভায় একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াননি---দ্রৌপদীর এতবড় অসন্মানের সময়েও তিনি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ বধূবেশিনী দ্রৌপদীকে প্রথম স্পর্শ করেই তাঁর মনে পড়েছিল---এই নারীই তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর কারণ হবে।

ধর্মপরায়ণা গান্ধারী । মহাভারত যদি ধর্মের অন্বেষণ করে থাকে, যে ধর্ম মানুষকে ধারণ করে থাকে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সংঘাতে তার পথ আলোকিত করে এই সে ধর্ম। এই ধর্মের প্রতি নারীর যে দৃঢ়চেতা মনোভাব তার প্রমাণ আমরা গান্ধারীর ধর্মপরায়ণতার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে পাই গান্ধারী বলেছেন---যুদ্ধে যাবার আগে সে আমার কাছে জয়ের আর্শীবাদ চাইতে এসেছিল; {অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মস্বমা ব্রবীতু মে, (১১/১৭/৫)(১০)} পারিনি দিতে বলেছিলোম যে পক্ষ ধর্ম, জয় সে পক্ষেই।

গান্ধারীর মাতৃস্নেহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাই, কৃষ্ণকে অভিশাপ দানের মাধ্যমে, গান্ধারী বলেছেন---

''জ্ঞাতি কুরুপান্ডবরা সকলে মারা যাবে। তোমার জ্ঞাতিরা মৃত, অমাত্যেরা মৃত, পুত্রেরা মৃত এমন অবস্থায় বনে বিচরণ করতে করতে কুৎসিত উপায়ে তোমার মৃত্যু হবে (১১/২৫/৪০, ৪১)।'[১১]

ধৃতরাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব পুত্রস্নেহ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে অর্থাত্ শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে। তিনি হেরে গেছেন নৈতিক সংগ্রামে; কিন্তু গান্ধারী একাই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হার মানেননি; বিদুর ও সঞ্জয়ের মত তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কর্তব্য সচেতন করে দিয়েছেন।

মহাভারত অংশাবতার অংশে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে স্বর্গের ধৃতি নাম্নী দেবী মর্ত্যভূমিতে মদ্ররাজা শল্যের ভগিনী মাদ্রী নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি অপূর্ব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ যুবতী নারী ছিলেন। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী অর্থশুল্কে তাঁর পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহ হয়। স্বামীপ্রেম মাদ্রীর গভীর ছিল। তিনি পাণ্ডুর সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতে ভালোবাসতেন। মৃগমুনি শাপের কথা জানা সত্ত্বেও মাদ্রী পুরোপুরি সতর্ক ছিলেন না। নির্জন বনে সূক্ষ্ম বসন পরে তিনি অনিচ্ছায় হলেও পাণ্ডুকে উদভ্রান্ত করে তুলেছিলেন এবং বলপূর্বকই সঙ্গমে লিপ্ত হলেন।

কিন্তু অঘটন (পাণ্ডুর মৃত্যু) ঘটে যাবার পরে তিনি চিত্তবোধ নষ্ট করেননি, যে অসংবৃত অবস্থায় তিনি ছিলেন তা তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল।

অত্যন্ত বুদ্ধিমতীর পরিচায়করূপে মাদ্রী। কুন্তীর কাছে দেব-অভিকর্ষণ মন্ত্র জানার পর তিনি বুঝেছিলেন, কুন্তী দ্বিতীয়বার তাঁকে এ মন্ত্র দেবেন না। তিনি সূর্যের পুত্র অশ্বিনীকুমার দ্বয়কেই আমন্ত্রণ জানালেন এবং যমজ দুই পুত্র নকুল সহদেবের জন্ম হল।

যশস্বিনী মাদ্রী মৃত রাজার অনুগমন করবেন বলে যোগ অবলম্বন পূর্বক ভারতীয় সাহিত্যে তিনি প্রথম স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন।

রাক্ষসী হিড়িম্বা এক অসাধারণ প্রেমময়ী একনিষ্ঠ নারী চরিত্র। সে পুত্রকে পিতার মতো ভ্রাতৃস্নেহপরায়ণ ও মাতৃবত্সল পুরুষ রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিল এবং পৌত্রকে শিখিয়েছিল পঞ্চপাণ্ডব তার একমাত্র সম্বল, সহায় এবং আত্মীয়।

সুভদ্রা মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। এই চরিত্রটি আরও বেশি অতুলনীয় হয়ে উঠেছে---দেবী যোগমায়ার অংশ বিশেষ হিসেবে, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী হিসেবে, বীর অভিমন্যুর মাতা হিসাবে ও গাণ্ডিবধারী অর্জুনের সহধর্মিণী হিসেবে।

মহাভারতে কিছু নারী চরিত্র লক্ষণীয়, যা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও তাদের মহত্ত্ব জীবনবোধ চিরশ্বাশ্বত। যেমন---উলূপী, চিত্রাঙ্গদা, সূর্যকন্যা তপতী প্রমুখ। রূপবতী, স্বাধীনচেতা, জ্ঞানী, যুক্তিবাদী, প্রতিভাশীল, প্রতিভাবান যাই বলা হোক না কেন উলূপী চরিত্রের জন্য কম বলা হবে। একদিকে একাকী সন্তান পালন, অপরদিকে কেবলমাত্র একদিনের জন্যও কাছে পেয়েও স্বামীর প্রতি প্রবল ভালোবাসা; দায়িত্বপরায়ণা থেকে সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে ওঠা মহাভারতের আপাত ক্ষুদ্র এই চরিত্রটির বিস্তার অতি বৃহত্।

নারীর রমণীয়তা যাঁর মধ্যে অনুপস্থিত, পুরুষালি বীর্য তেজে যিনি অনন্যা। ব্যাসদেবের চিত্রাঙ্গদা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চরিত্র।

মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের দুহিতা চিত্রাঙ্গদা। রাজাকূলে চিত্রাঙ্গদা নারীরূপে জন্মালেও রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি। এই চরিত্রটির মাধ্যমে নারীর আত্মজাগরণের ও পতিব্রতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

মহাভারতে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের প্রমুখ অষ্টভার্যার মধ্যে দ্বিতীয় ধর্মপত্নী। দ্রৌপদী ও সত্যভামার অমলিন সখিত্বের সাক্ষাত্কার মহাভারতের একটি অত্যন্ত দুর্লভ মুহূর্ত।

মহাভারতের কাহিনীতে একটি অত্যন্ত অল্পবয়সী নারীর চিত্র লক্ষণীয় উত্তরা। তিনি অভিমন্যুর স্ত্রী, বিরাটরাজার কন্যা। তাঁর, স্বামী অভিমন্যুর প্রতি পতিস্নেহ ছিল। অন্যকুরুনারীদের মতোই তাঁর পরবর্তী জীবন বৈধব্যের জীবন। সে জীবনে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না।

মহাভারতে আরও একটি নারী চরিত্রের ক্ষুদ্র উল্লেখ পাই যেমন জরা নাম্নী কামরূপিনী রাক্ষসী। মহাভারতে তাঁর অপূর্ব মাতৃ-মমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতে বর্ণিত সত্যবতী হস্তিনাপুরের কুরুরাজ শান্তনুর মহিষী। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রপিতামহী এবং তিনি বেদব্যাসের জননী। রাজকন্যা সত্যবতী ধীবরের

গৃহে লালিতা। তাঁর গায়ে তীব্র মাছের গন্ধ থাকায় তাঁর আরেক নাম 'মত্স্যগন্ধা'। সত্যবতীর সপত্নীপুত্র ভীষ্ম তাঁকে মাতা 'দাশেয়ী' নামেও সম্বোধন করতেন যেহেতু তিনি দাশরাজের পালিতা কন্যা। সত্যবতীর দেহে মত্সর দুর্গন্ধ থাকায় পরাশর বররূপে তাঁর শরীরের দুর্গন্ধকে মৃগনাভির সৌরভে রূপান্তরিত করেন ; সেজন্য তিনি 'গন্ধবতী' ও লোকসকল এক যোজন দূর থেকে সত্যবতীর শরীরের আঘ্রাণ-সৌরভ লাভ করত ; তাই তার 'যোজনগন্ধা' নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।

মহাভারতে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য নারী হলেন শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী। দৈত্য রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী দুজনে সখী ছিলেন।

মহাভারতে গঙ্গা হলেন দেবব্রত-ভীষ্মের মাতা। গঙ্গার পতি শান্তনু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন---গঙ্গার স্বভাব, ব্যবহার, রূপ, উদারতা এবং নির্জনে পরিচর্যায় অতুলনীয়া। গঙ্গা স্বর্গীয় দেবী হয়েও, নদীশ্রেষ্ঠা হয়েও, মনুষ্যমূর্তি ধারণ করে রাজার বাস্তবিক ভার্যার মতোই সর্বদা পতিব্রতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া মহাভারতে অম্বিকা-অম্বালিকা ও অনামিকার কথা পাই, যাঁরা ছিলেন দেবতুল্য ও কুরবংশের বৃদ্ধিকারী যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট, পাণ্ডু ও ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বিদুরের মাতা।

অদিতি হলেন দক্ষ কন্যা ও মরীচ পুত্র কশ্যপের স্ত্রী।

উপরিক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায়, নারীবাক্যে যেটুকু আমরা পাই তা গোঁড়া মতাদর্শের কাছে তেজস্বিনী দ্রৌপদী, প্রতিবাদিনী অম্বা, শকুন্তলা, পতিব্রতা গান্ধারী ও অন্যান্যরা যাঁরাই কথা বলেছেন, প্রতীকী পন্থায় নতুন দেবসমাজে তাঁরাই অঙ্গীভূত হয়েছেন, অধিকাংশই তাঁরা দৈব অধিকারী বলিয়সী হয়ে উঠেছেন। আবার অন্যদিকে প্রেমময়ী নারী হয়ে উঠেছেন---যশস্বিনী সহমৃতা মাদ্রী, মৎসগন্ধা সত্যবতী, পতিব্রতা হিড়িম্বা, মণিহর দুহিতা চিত্রাঙ্গদা, কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রা, কৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামা, অভিমন্যু পত্নী উত্তরা, নাগকন্যা উলূপী প্রমুখ।

মহাভারতে নারীর নৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যদা ও দৈহিক শক্তির উৎকর্ষ স্বীকার করে নিলেও নিপীড়ন বাড়বাড়ান্ত লক্ষণীয়। কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারীর মতো নারীব্যক্তিত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছিলেন সত্য, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজ সে প্রতিবাদ উপেক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। যেমন---দ্রৌপদীর প্রাকাশ্যে লাঞ্ছনা, পঞ্চস্বামীকে বিবাহে বাধ্য, অনিচ্ছুক নারীদের ওপর মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া যেমন---অম্বিকা ও অম্বালিকা, কুন্তী প্রমুখ নারী।

এইসব নারী চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। যাঁদের প্রভাব কেবলমাত্র প্রজাপুঞ্জের উপরে নয়, ভাবীকালের উপরেও পড়েছে।

সারসংক্ষেপ

মহাভারত ও নারী

মহাভারত যেন এক বিস্তৃত বিশ্বকোষ। আদি পর্বে বলা হয়েছে---'মহত্ত্বাদ্ ভারবতাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।'

মহাভারতে প্রতিবাদী নারী চরিত্র আছে, যাঁরা দৈব বা ভাগ্য বলে কোনো কিছুকে মানেনি। নারীত্বের দাবি নিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। প্রতিবাদী নারী অম্বার পুরুষের অবিমৃশ্যকারিতায়, প্রত্যাঘ্যাতা রমণীর প্রতিশোধ স্পৃহা কতদূর যেতে পারে, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মমতাময়ী চির মনস্বিনী কুন্তীর বিবাহ, স্বামীর প্রজনন শক্তি হারানো, পুত্রদের প্রতিমুহূর্তে গুপ্তহত্যার আশঙ্কা, দ্যূতক্রীড়ায় পুত্রবধূর লাঞ্ছনা, কানীন পুত্র ও পৌত্রদের বিনাশ জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা এবং আশ্রমে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবনে সবটাই নিঃসঙ্গতা।

পৃথিবীর চার আদি মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা তেজস্বিনী নারী দ্রৌপদী। মননশীলতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি যেকোনো বিপদের মুখোমুখি হওয়া সাহস, স্বামীগর্বে গর্বিতা দ্রৌপদী, তাই মুনিঋষিদের চোখেও মহাভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্তর্গত। পুরুষ প্রধান সমাজে এই নারীটি তাই চিরশ্রদ্ধেয়া।

পরিব্রতা গান্ধারী, অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে অতিক্রম করবেন না বলে যিনি সারা জীবন চক্ষু আবৃতা রাখলেন।

সত্যনিষ্ঠা, নৈতিক ও ধর্মপরায়ণ গান্ধারী যুদ্ধের আগে বলেছিলেন---যে পক্ষ ধর্ম, জয় সে পক্ষেই। এই ধর্মপরায়ণতার জন্যই আজ মৃত পুত্রের পাশে দাঁড়িয়েও থাকবার সময়ে আজও মাতৃ-হৃদয়কে দুঃসহ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

মহাভারত অংশাবতার অংশে জানা যায় মাদ্রী ধৃতির অংশাবতার। তিনি যোগ প্রাণয়ম জানতেন। তিনি স্বেচ্ছায় স্বামী পাণ্ডুর চিতায় মৃত্যুবরণ করেন। মাদ্রী ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম স্বেছামৃত্যু বরণ করেছিলেন।

রাক্ষসী হিড়িম্বা এক অসাধারণ প্রেমময়ী নারী চরিত্র। সমাজচ্যুতা হওয়া সত্বেও স্বামী ভীমের প্রতি তার অনুরাগ অটুট ছিল।

কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার চরিত্রটি মহাভারতে অতুলনীয়া হয়ে উঠেছে---দেবী যোগমায়ার অংশ বিশেষ হিসেবে, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী হিসেবে, বীর অভিমন্যুর মাতা হিসেবেও গাণ্ডিবধারী অর্জুনের সহধর্মিণী হিসেবে।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ধর্মমত্নী সত্যভামা। দ্রৌপদী ও সত্যভামার অমলিন সখিত্বের সাক্ষাত্কার মহাভারতের একটি অত্যন্ত দুর্লভতম মুহূর্ত।

এই মহাকাব্যে একটি অত্যন্ত অল্পবয়সী নারীর চিত্র লক্ষণীয় উত্তরা, যিনি পতিস্নেহা ও তাঁর অবশিষ্ট বৈধব্য জীবনে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না।

এছাড়াও মহাভারতে কিছু নারী চরিত্র লক্ষণীয়, যা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও তাঁদের মহত্ত্ব ও জীবনবোধ চিরশাশ্বত। যেমন---শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী, সত্যবতী, সূর্যকন্যা তপতী, বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা, নাগকন্যা উলূপী, মণিপুর দুহিতা চিত্রাঙ্গদা, অম্বিকা-অম্বালিকা-অনামিকা মাতা, রাক্ষসীজরা, দেবনদী গঙ্গা, অদিতি ও উর্বশীর চরিত্র প্রমুখ।

উপরিক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বলা যায়, নারীবাক্যে যেটুকু আমরা পাই তা গোঁড়া মতাদর্শের কাছে তেজস্বিনী দ্রৌপদী, প্রতিবাদিনী অম্বা, শকুন্তলা, পতিব্রতা গান্ধারী ও অন্যান্যরা যাঁরাই কথা বলেছেন, প্রতীকী পন্থায় নতুন দেব সমাজে তাঁরাই অঙ্গীভূত হয়েছেন, অধিকাংশই তাঁরা দৈব অধিকারী বলিয়সী হয়ে উঠেছেন।

মহাভারতে নারীর নৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও দৈহিক শক্তির উৎকর্ষ স্বীকার করে নিলেও নিপীড়েন বাড়বাড়ন্ত লক্ষণীয়। কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারীর মতো নারীব্যক্তিত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছিলেন সত্য, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজ সে প্রতিবাদ উপেক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। যেমন---দ্রৌপদীর প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা, পঞ্চস্বামীকে বিবাহে বাধ্য, অনিচ্ছুক নারীদের ওপর মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া। যেমন---অম্বিকা ও অম্বালিকা, কুন্তী প্রমুখ নারী।

এইসব নারী চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। যাঁদের প্রভাব কেবলমাত্র প্রজাপুঞ্জের উপরে নয়, ভাবীকালের উপরেও পড়েছে।

তথ্যসূত্র

(১) আদিপর্ব (১৩০০)

(২) (১/৫৯/১)

(৩) (৬/৩৩/৩২)

(৪) মহাভারত (১১/১৫/১৩)

(৫) সভা : ৬২/৯

(৬)আশী বিষানিব ক্রুদ্ধান্ পদীন্ পরিচ্রাম্যহম্। (৩২/২২/১৮)

(৭)অহং পদীন্নদিশয়ে নাদ্যশ্নে নাদিভূষয়ে। নাপি পরিবদে শ্বশ্রুং সর্বদা পরিযত্রিদা।

(৮)সদারান্ পাণ্ডবান্নিদ্যং প্রয়দোপচরাম্যহম। (৩/২২/২১৮)

(৯) পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাদনঃ।

প্রাণানপি পরিদ্যজ্য যদ্ভর্তৃহিদমাচরেৎ। (৩/১৪/৪)

(১০)(১১/১৭/৫)

(১১)(১১/২৫/৪০, ৪১)

সূত্রনির্দেশ

১. দেবকুমার দাসঃ সংসৃকত সাহিত্যের ইতিহাস, অষ্টম সংস্করণ, ১৪১৬, পৃঃ ৭২।

২। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৮২।

৩। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৮২।

৪। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ১১৬।

৫। ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যঃ মহাভারতের নারী, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮, পৃঃ ২১৮।

৬। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃদীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৯৪।

৭। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৯৪।

৮। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৯৪।

৯। সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ৯৪।

১০।সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ১১৭।

১১।সুকুমারী ভট্টাচার্যঃ প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১৫, পৃঃ ১১৭।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র। মহাভারতের নারী। কলকাতা : আনন্দ প্রকাশক, ২০১০।

২. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারতের নারী ও সমাজ, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ প্রকাশক, ২০০৬।

৩. তাস, দেবকুমার। সংসৃকত সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা : সদেশ প্রকাশক ১৪০৪।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। সংসৃকত সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষত্ প্রকাশক, ১৯৮৮।

৫. মুখোপাধ্যায়, গোপেন্দু। সংসৃকত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। কলকাতাঃ ইউনাইটেড বুক এজেন্সি প্রকাশক, ১৪১৯।